দুই ধারার রাজনীতির দুই শিক্ষানীতি

শেখর দত্ত

সরকার বিগত আওয়ামী লীগ আমলের শিক্ষানীতি বাতিল করেছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং জাতীয় সংসদেও শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, জাতীয় ভাবধারা ও মূল্যবোধের আলোকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য নতুন জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। পাকিস্তানি আমল থেকে শুরু করে উপরোক্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পূর্ব পর্যন্ত যতোটুকু হিসাব করতে পারছি— ৬ বার শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আইয়ুব আমলে '৬২ সালে ও '৬৪ সালে হামুদুর রহমানকে, ইয়াহিয়া খানের আমলে '৬৯ সালের নূর খানকে, বঙ্গবন্ধুর আমলে ড. কুদরত-ই-খুদাকে, এরশাদ আমলে মজিদ খানকে, শেখ হাসিনা আমলে প্রফেসর শামসুল হককে প্রধান করে কমিশন গঠন করা হয় এবং সব কটি কমিশনই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। কিন্তু এর কোনোটাই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সরকার পরিবর্তনের ফলে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার আমলের ২টি বাতিল এবং আন্দোলনের ফলে অপর ৪টি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, প্রয়াত জিয়াউর রহমানের-সাত্তারের আমল ও ৯১-৯৬ খালেদা জিয়ার বিএনপির আমল ছাড়া আর সকল আমলেই (মোস্তাকের আমল ধর্তব্যের মধ্যে নয়) শিক্ষানীতি প্রণয়নের ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার আমল ছাড়া অপর সবগুলোর উদ্যোগই নেওয়া হয় সামরিক স্বৈরাশাসকদের দ্বারা। সামরিক স্বৈরশাসকদের প্রণীত শিক্ষানীতিগুলোর মধ্যে একমাত্র গণহত্যাকারী ইয়াহিয়ার আমলে প্রণীত নূর খানের শিক্ষানীতি জামাতে ইসলামী ও এর অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ সমর্থন করেছিল, কিন্তু বাকিগুলো কোনো রাজনৈতিক দল অথবা ছাত্র সংগঠন সমর্থন করেনি।

উপরের তথ্য থেকে একথা বলা যায়, বিএনপি এবারেই প্রথম জামাতকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নে হাত দিয়েছে। অবশ্য জিয়া আমলের প্রথমদিকে একবার শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল; কিন্তু যতোটুকু মনে হয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের পদত্যাগের ভিতর দিয়ে তার ক্রিয়াকলাপ সাঙ্গ হয়ে যায়।

এই তথ্যগুলো বিবেচনায় নিলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষানীতি গ্রহণ আর বাতিল-প্রত্যাহারের এই ধারা দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে চলছে কেন? আর এবারে বিএনপি-জামাত যে উদ্যোগ নিয়েছে তা কি বাস্তবায়িত হবে?

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং বোধকরি সকল মহলই স্বীকার করবেন যে, সুদীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ শিক্ষানীতি গ্রহণ আর বাতিল-প্রত্যাহারের ধারা আমাদের দেশের চলমান রাজনীতি থেকে উৎসারিত। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে যে দাবি জাতির সামনে চলে আসে তার অন্যতম হলো শিক্ষানীতি। '৫৪ সালের নির্বাচনে ২১ দফার ৯ম ও ১০ম দফায় 'শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক করা' দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দাবির অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিক ছিল। কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর প্রথম আক্রমণ তথা বাংলা ভাষার ওপর আঘাতের লক্ষ্যই ছিল শিক্ষাকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকদের ইচ্ছামতো পদানত করে বাঙালি জাতির ধ্বংসসাধন। ভাষা আন্দোলনের বিজয় ও '৫৪-এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের কবর রচিত হওয়ার পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের উপরোক্ত শিক্ষা সম্পর্কিত ইচ্ছা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু '৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক আইন জারির পর প্রথমেই তারা শিক্ষার ওপর আঘাত হেনে শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শহীদের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যে ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়, তাতে আইয়ুব খান ঐ শিক্ষানীতি বাতিল করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু আবারো আইয়ুব খান '৬৫-এর নির্বাচনে সর্বদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাকে পরাজিত করে বিজয়ী হওয়ার পর পরই হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট চাপিয়ে দেয়। কিন্তু ৬ দফা, ১১ দফার গণঅভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে তার কবর রচিত হয়। ছাত্র সমাজের ১১ দফার ৬নং দফায় শিক্ষানীতির দাবিটি স্থান পায়। ফলে ছাত্র সমাজ আলোড়িত হয়ে ওঠে এবং তা রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শাসন রক্ষার স্বার্থে শেষ চেষ্টা করে ইয়াহিয়া খানের স্বল্পকালীন শাসনের সময়। জাতীয় নির্বাচন সামনে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে নূর খানের শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এবারে জামাতসহ ইসলামপন্থী দলগুলোর সমর্থন সত্ত্বেও ঐ শিক্ষানীতি একই পরিণতি বরণ করে।

পাকিস্তানি আমলের উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহ থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পরাধীন পাকিস্তানি আমলে দুই ধারার রাজনীতির সংগ্রামই দুই ধরনের শিক্ষানীতির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

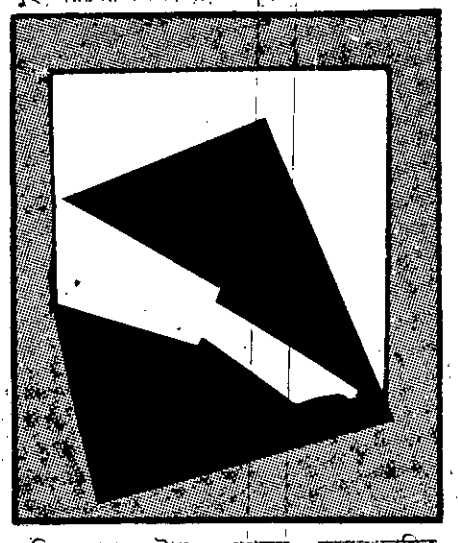

বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক জাতিয়তাবাদ, জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় বিচারের উপদানসমৃদ্ধ জাতীয় মূলধারার সংগ্রাম এক ধরনের শিক্ষানীতির দৃষ্টিভঙ্গিও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে তুলে ধরে। আর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি ও তাদের সহযোগী এদেশীয় দালালরা অগণতান্ত্রিক-সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত শোষণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিপরীত ধরনের শিক্ষানীতি জাতির ওপর চাপিয়ে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। স্বভাবিকভাবেই ধারণা করা গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ঔপনিবেশিক আমলের জাতিবিরোধী-গণবিরোধী ধারার চির অবসান ঘটবে এবং জাতি তার বহু আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি পাবে।

দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যেই স্বাধীনতার পর শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। কিন্তু '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যায়। এই পটপরিবর্তন মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যে বিষয়গুলো জাতীয়ভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়েছিল; যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসেবে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; তাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবন থেকে ক্রমে ক্রমে নির্বাসিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়া সামরিক শাসনের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভাবধারা আমদানি করে কার্যত বাংলাদেশের রাজনীতিতে পাকিস্তানি আমলের দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণাকেই নতুন পরিস্থিতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ফলে পাকিস্তানি আমলের মতোই রাজনীতিতে দুই ধারা সৃষ্টি হয়। জিয়া উপরোক্ত ধারায় বাংলাদেশকে পুনঃস্থাপন করলেও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিবেচনায় নিয়ে রাজনীতি ও সমাজজীবনে ভারসাম্যের নীতি প্রয়োগ করে অগ্রসর হন। ফলে কোনো চিরস্থায়ী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথে তিনি অগ্রসর হননি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভাবধারা সামনে রেখে তার আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। তাই জিয়া আমলে সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন নিয়ে কোনো তৎপরতা ও তার

এখন প্রশ্ন বিএনপি-জামাত যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে তা কোন ধারার প্রতিনিধিত্ব করবে? নিঃসন্দেহে বলা চলে, অন্তত ঐ শিক্ষানীতি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার' ধারে কাছেও যাবে না। ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় সংসদে শিক্ষানীতি প্রণয়নের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেছেন তাতে উপরোক্ত বিষয়ে কিছুই বলা নেই বরং বিপরীত ধারায় শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়ার ইঙ্গিতই রয়েছে।

বিপরীতে শিক্ষানীতি আন্দোলনের কোনো ইস্যু হয়নি। প্রসঙ্গত, জিয়ার আমলে ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন রূপে বাধ্যতামূলক করায় শিক্ষাঙ্গন দলীয় রাজনীতির সংঘাতপূর্ণ চারণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বলাই বাহুল্য, এরশাদ আমলে ঐ ভারসাম্যের নীতি রক্ষিত হয়নি। ফলে এরশাদ ক্ষমতায় এসেই ড. মজিদ খানকে শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করে সামরিক শাসনের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ড. মজিদ খানের শিক্ষানীতিতে দুটো বিদেশী ভাষা ইংরেজি ও আরবি বাধ্যতামূলক এবং শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি বেআইনি করা হয়। এই ধরনের শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হচ্ছে প্রচারিত হলে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের মধ্যে মারাত্মক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালননের কর্মসূচি সামনে রেখে ঢাকার ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী প্রথম প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। বলা চলে, সুদীর্ঘ ৯ বছর ধরে এরশাদবিরোধী যে আন্দোলন চলছিল, ১৯৮২ সালের শিক্ষা দিবস পালনকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল এর যাত্রা। ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সকল ছাত্র সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ মজিদ খানের শিক্ষানীতিকে 'কুখ্যাত সনদ' বলে প্রত্যাখ্যান করে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনই ক্রমে ৮, ৭ ও ৫ দলের তিনজোটের আন্দোলনরূপে সেশনজট ছড়িয়ে পড়ে। তিন জোটের ঐতিহাসিক রূপরেখায় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে' কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন দাবি সহ নানা শ্রেণী ও পেশার মানুষের দাবিগুলোকে সমর্থন করা হয়। এরশাদ পতনের দিন ৪ ডিসেম্বর '৯০ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য যে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেয়, তাতে ছাত্রসমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবি বাস্তবায়িত করার বিষয়টি জরুরিভাবে সামনে আনা হয়। এই ইতিহাস এজন্যই তুলে ধরা হলো যে, বিএনপি ও ছাত্রদল 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে' ছাত্রসমাজের দাবির ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন।

যাই হোক, '৯১-এর নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভের পর শিক্ষানীতি সম্পর্কিত ঐ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য প্রফেসর শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে যে কমিশন গঠন করে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য জাতীয় সংসদের পাঁচজন সদস্যকে উপদেষ্টা করা হয়। তাতে বিএনপি সাংসদদের রাখা হয়। তবে এ কমিটির কর্মকাণ্ডে বিএনপি সাংসদরা যোগদান না করলেও জাতীয় পার্টি তাতে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষানীতিটি প্রণীত হওয়ার পর বিএনপিসহ কোনো মহলই ঐ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেনি। ঐ শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন শুরু হলেও তা উন্নত অথবা সংশোধন করার সুযোগ রাখা হয়। কিন্তু এক বছরের মাথায় এসে বিএনপি-জামাত সরকার ঐ শিক্ষানীতি বাতিল করে এবং নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের ঘোষণা দেয়। প্রসঙ্গত, বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষানীতি বাতিল ও নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কোনো অঙ্গীকার ছিল না। এখন প্রশ্ন বিএনপি-জামাত যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে তা কোন ধারার প্রতিনিধিত্ব করবে? নিঃসন্দেহে বলা চলে, অন্তত ঐ শিক্ষানীতি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার' ধারে কাছেও যাবে না। ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় সংসদে শিক্ষানীতি প্রণয়নের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেছেন তাতে উপরোক্ত বিষয়ে কিছুই বলা নেই বরং বিপরীত ধারায় শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়ার ইঙ্গিতই রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা ইতিপূর্বে ঘোষণা দিয়ে ঐ ধরনের আশঙ্কাকেই আরো জোরদার করছেন।

বস্তুতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব ও জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনীতি আজ আবার সুস্পষ্টভাবে দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক অগণতান্ত্রিক ও জাতীয় ঐক্য-সম্প্রীতি বিরোধী রাজনৈতিক ধারা আর অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও জাতীয় ঐক্য সম্প্রীতির পক্ষের রাজনৈতিক ধারা মুখোমুখি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরই পরিণতিতে বিগত আওয়ামী লীগ আমলের শিক্ষানীতি বাতিল হয়েছে এবং বর্তমানে বিএনপি-জামাত নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে তৎপর রয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে বলা চলে, যতোদিন এই দুই ধারার অবস্থান মুখোমুখি থাকবে ততোদিনই শিক্ষানীতি প্রণয়ন আর প্রত্যাখ্যান-বাতিলের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এখন প্রশ্ন হলো, বিএনপি-জামাত যদি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তবে কি তা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হবে নাকি সরকার পরিবর্তনের পর তা বাতিল হবে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

২২-১১-২০০২

শেখর দত্ত : রাজনীতিক।

NOV 24 2002